—ভারত সরকারের বাজেট যুদ্ধের বাজেট—

জনতার মুখে অন্ন দেবার বদলে তাদের বুকে গুলি মারার ব্যবস্থা

● দেশবাসীর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি ●

SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA
(West Bengal State Committee)
48 [illegible]ramtola Street, Calcutta-13.

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জ্জী
সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা | রবিবার, ১লা এপ্রিল ১৯৫১, ১৮ই চৈত্র ১৩৫৭ | মূল্য—দুই আনা

ভারতীয়রাষ্ট্রের অর্থসচিব, চিন্তামণি দেশমুখ, পার্লামেন্টে ১৯৫১-৫২ সালের বাজেট পেশ করেছেন। তাতে প্রচলিত করের ভিত্তিতে সরকারের সম্ভাবিত রাজস্ব আদায় ধরা হয়েছে ৩৭০ কোটী টাকা আর ব্যয়ের পরিমাণ হল ৩৭৫ কোটী টাকার সামান্য কিছু বেশী। সুতরাং অর্থসচিবের মতে ঘাটতি দাঁড়ায় ৫ কোটী টাকার কিছু বেশী। এই ঘাটতি পূরণ করার জন্য ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অতিরিক্ত কর ও শুল্ক ধার্য্য করেছেন কয়েকটি জিনিষের ওপর। এই বর্দ্ধিত ট্যাক্স ও শুল্কের মারফৎ আয় বাড়বে ৩১ কোটী টাকা। তাহলে বাজেটে উদ্বৃত্ত দাঁড় করান হল ২৬ কোটী টাকার মত।

এখন প্রশ্ন হল এই যে পাঁচ কোটী টাকার ঘাটতি দেখান হয়েছিল তা কি বাস্তব, না তার অন্য উদ্দেশ্য আছে। ধনিক শ্রেণীর পত্রিকাগুলি এবং পার্লামেন্টের কংগ্রেসী চাঁইরা পর্য্যন্ত এই ঘাটতিকে অবাস্তব কাগজ পত্রে ঘাটতি বলে বর্ণনা করেছে। ইংরাজ শাসনের যুগে সাম্রাজ্যবাদীদের দস্তুর ছিল বাজেটে ঘাটতি দেখান। কারণ বাজেটে ব্যয়ের চেয়ে আয় কম এই কথাটা প্রমাণ করতে পারলে জনসাধারণের ওপর ইচ্ছামত ট্যাক্স বাড়ান চলে এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণ আরও বেশী করে করা যায়। সুতরাং ইংরাজ শাসন কর্ত্তারা এই জন্য বাজেটে ঘাটতি দেখাত। ইংরাজ কর্ত্তারা চলে গিয়েছে কিন্তু দেশে তাদেরই প্রতিষ্ঠিত শাসন যন্ত্রটি অক্ষুণ্ণভাবে কাজ করে চলেছে। রাইসম্যান চলে গিয়েছেন কিন্তু তার শিষ্য প্রশিষ্যরা আজ অর্থ বিভাগের কর্ণধার। ইংরাজ আমলে যে ভদ্রলোকটি ইংরাজ প্রীতির পুরস্কার হিসাবে সর্বপ্রথম রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দেশীয় কর্ম্মকর্ত্তা হন, যাঁর পরামর্শক্রমে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে ষ্টার্লিং চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় ভারতীয় স্বার্থ চূড়ান্ত ভাবে বিসর্জিত হয়। মুদ্রামূল্য হ্রাসের যিনি পাণ্ডা এবং যার জন্য ভারতবর্ষ ঘরে বাইরে সর্বত্র ক্ষতিগ্রস্ত তিনি ভারতবর্ষের অর্থ বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা। সুতরাং ইংরাজ গুরুর পথ অনুসরণ করে, ইংরাজ [illegible] স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে, দেশীয় ধনিক চক্রের গায়ে হাত না দিয়ে নিরন্ন দেশবাসীর গলায় ছুরি চালাবার ব্যবস্থা তিনি যে বাজেটে করবেন তাতে আর অবাক হবার কি আছে?

ভারতীয় বাজেটে যে জিনিষটা সবার আগে চোখে পড়ে তা হল সরকারী আয়ের সল্পতা। ভারতবর্ষ একটি বিরাট দেশ, মহাদেশ বললেও অত্যুক্তি হয় না, আয়তন, লোকসংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ কোন দিক হতেই ভারতবর্ষের অবস্থা হীন নয়। তবু কেন সরকারী আয় এত কম? সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েটের কথা ছেড়েই দেওয়া গেল। নয়াচীন ও মধ্য ইউরোপের নয়াগণতান্ত্রিক দেশগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায় কি দ্রুত হারে তাদের জাতীয় আয় বেড়ে চলেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার আয়তন ভারতবর্ষের একটা প্রদেশের মত অথচ তার জাতীয় আয়ের পরিমাণ হল ১৩২০০ কোটী কোরুনী, পোল্যাণ্ড গোটা বাংলার মত কিন্তু তার সরকারী আয় হল ১০৫৬০০ কোটি জোলোটি। শুধু যে আপেক্ষিক ভাবে এই সব দেশের জাতীয় আয় ভারতবর্ষের আয়ের চেয়ে বেশী তাই নয়। প্রতি বছর এই সমস্ত দেশ তাদের জাতীয় আয় বাড়িয়েই চলেছে। গত এক বছরের মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়ার জাতীয় আয় বেড়েছে ৪৩০০ কোটী কোরুনী, পোল্যাণ্ডের ২১৩০০ জোলোটি। রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া প্রভৃতি দেশেই এই উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। আর জাতীয় আয় বাড়ার সাথে সাথে জনসাধারণের জীবন ধারণের মান উন্নত [illegible] জনতাকে করভারে নিষ্পিষ্ট করে সেখানে আয় বাড়ান হয় না। জাতীয় আয় বাড়াবার পথ হিসাবে এই সব দেশে দ্রুত শিল্পকরণ হচ্ছে, জমি বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ আবাদ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বড় বড় কলকারখানা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়েছে, জমি হতে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ উচ্ছেদ করা

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

কংগ্রেসী মন্ত্রীর চোরা কারবার

মাদ্রাজের মন্ত্রী রাজনের কাছ হতে ১৫০০ বস্তা চাউল উদ্ধার

মাদ্রাজ প্রদেশে খাদ্যাভাবের দরুণ জনসাধারণের দুরবস্থার শেষ নেই, সেখানে প্রায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। নতুন ফসল সবে উঠেছে তবুও খাদ্যের এই অবস্থা। হাজার হাজার লোক মাঠে যে দু চারটা ধান ঝরে পড়ে আছে তাই সংগ্রহ করার জন্য চার পাঁচ মাইল যেতে আপত্তি করে না। গাছের পাতা ও মূল খেয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে গরীব চাষী এ খবর কংগ্রেসী সংবাদপত্র গুলিও চেপে রাখতে পারেনি। অথচ জনসাধারণের খাদ্য নিয়ে বেমালুম চোরাকারবার চালাচ্ছে বড়লোকের দল। তাদের এই কালোবাজার চালাবার পূর্ণ সুযোগ ও সুবিধা দিয়ে চলেছে মাদ্রাজের মন্ত্রীমণ্ডলী শুধু যে সুযোগ ও সুবিধা দিচ্ছে তাই নয়; তারা নিজেরাও চোরাকারবার চালাচ্ছে। মাদ্রাজের অন্যতম মন্ত্রী ডাঃ টি, এম, রাজনের বিরুদ্ধে চাল মজুত করা ও কারবার চালাবার অভিযোগ উত্থাপিত হয় মাদ্রাজ পরিষদে। এমন কি তাঁর হেপাজাত হতে ১৫০০ বস্তা চাল পাওয়া যায়।

[illegible] তার উপযুক্ত শাস্তি মিলত। কিন্তু কংগ্রেসী রামরাজত্ব হল চোরাকারবারীদের রাজত্ব। তার মন্ত্রীরা চোরাকারবার চালায় একদিকে, অন্যদিকে মুখে সত্য, সততা, প্রভৃতি সম্বন্ধে বড় বড় কথা আওড়ায় তাদের আসল রং জনসাধারণের কাছে ঢাকবার উদ্দেশ্যে। প্রত্যেক প্রদেশেই এ কারবার চলছে। পশ্চিম বাংলায় মন্ত্রীর বিড়লা কোম্পানীকে ১ কোটী টাকা ট্যাক্স ফাঁকি মারতে সাহায্য করা, বিহারের গুড়ের কেচ্ছায় মন্ত্রীদের মোটা টাকা লুঠ করা, যুক্ত প্রদেশে মন্ত্রীদের কাপড়ের ও চিনির চোরাকারবারীদের সঙ্গে লাভ ভাগাভাগি, বোম্বাই এর মন্ত্রীদের লুকিয়ে কাগড় জোগাড় করা, রাজস্থান ও ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে নগদ টাকা পয়সা মারা যদি বেকসুর চলতে পারে তাহলে ডাঃ রাজন খাদ্য নিয়ে কালোবাজারী করেছেন তাতে আর অবাক হবার কি আছে। যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের পূজ্যপাদ মন্ত্রীরাই দাপটে জনতার রক্তে অর্জিত টাকায় ভরছে ঘরের সিন্দুক, সেখানে প্রাদেশিক মন্ত্রীরাতো এ রকম করবেই। কংগ্রেসী রামরাজত্বে হনুমান মন্ত্রীদের যদি লুঠতরাজের সুবিধা না [illegible] কোথায়?

সাম্রাজ্যবাদ তোষণ ও শোষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই নতুন ট্যাক্স ধার্য্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে, ধীরে ধীরে গোটা অর্থনীতিকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই সেদিন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নাৎসী বর্বরতায় এই দেশগুলি একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, বিপর্যাস্ত অর্থনীতি হতে আজ এই দেশগুলি কি প্রচণ্ড উন্নতিই না করেছে। আর ভারতবর্ষ এত বড় দেশ, এত প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্বেও ধুঁকছে। কারণ আজ ও তার বুকের ওপর সাম্রাজ্যবাদী থাবা বসে আছে। সরকারী হিসাব মতে সারা ভারতবর্ষে বিদেশী লগ্নি পুঁজির পরিমাণ হল ৫৯৬ কোটী টাকা। এ হিসাব সম্পূর্ণ নয়, অংশমাত্র যেহেতু যে সমস্ত বিদেশী কোম্পানী টাকা মুলধন নিয়ে এদেশে ব্যবসা চালাচ্ছে তাদের এর মধ্যে ধরা হয় নি। এই বিরাট বিদেশী লগ্নি পুঁজি ভারতবর্ষ হতে ভারতবাসীর রক্ত শুষে হাজার হাজার কোটী টাকা লুটে নিয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্য তো বিদেশীর দ্বারা চালিত, ফলে তার লাভ ভারতবর্ষ পায় না। শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের দেশ ইঙ্গ মার্কিণ ধনকুবেরদের দয়ার ওপর নির্ভরশীল, ভারী শিল্প তেমন ভাবে গড়ে ওঠে নি, ক্যাপিট্যাল গুডস্ তৈরী হয় না, সাম্রাজ্যবাদী অবাধ শোষণের ক্ষেত্র হিসাবে আজও রয়েছে সে। ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী শিল্পে প্রসারের চেয়ে বাণিজ্যে বেশী লাভ হয় দেখে শিল্প প্রসারের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিলাতী মরিস গাড়ী দেশী হিন্দুস্থান হচ্ছে, বিলাতী অষ্টিন দেশী অশোক কোং নাম নিচ্ছে, বিলাতী বি, এস, এ, ভারতবর্ষে প্রস্তুত বলে চলতে চাইছে। এখানে অংশগুলি শুধু জোড়া হচ্ছে। তাতে করে গোটা গাড়ী আনতে হলে যে কাষ্টম ডিউটি দিতে হত তার চেয়ে কম দিতে হচ্ছে পুজিপতিদের, তার ওপর দেশী নাম ধারণ করে জাতীয় মনোভাবের সুযোগ নিয়ে জিনিষগুলিকে চড়া দামে বিক্রী করা হচ্ছে। ভারতীয় পুজিবাদী রাষ্ট্র বিদেশী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবেনা, বড় বড় শিল্প, খনি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে নারাজ, জমিদারী প্রথা বিনা খেসারতে বিলোপ করার কথা চিন্তা করে না। সাম্রাজ্যবাদী সামন্ততন্ত্রী ও একচেটিয়া পুঁজিবাদী শোষণে বিপর্যাস্ত ভারতবর্ষ। তার আয় বাড়তে পারে না এগুলিকে টিকিয়ে রেখে। কেন্দ্রীয় বাজেটে এই সব প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থা দূর করে দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবার কোন চেষ্টা নেই।

একে তো বাজেটে আয়ের পরিমাণ এই, তার ওপর তার অর্দ্ধেকের বেশী টাকা সামরিক খাতে ব্যয় মঞ্জুর করা হয়েছে। মোট ব্যয়ের পরিমাণ যেখানে ৩৭৫ কোটী টাকা সেখানে এক সামরিক খাতে ব্যয়িত হবে ১৮০ কোটী ২ লক্ষ টাকা। এ ছাড়াও মূলধন হিসাবের মধ্যে এই খাতে ১৪ কোটী ৯৭ লক্ষ ধরা হয়েছে। তাহলে যুদ্ধখাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াল প্রায় ১৯৫ কোটী টাকা। বাজেটের মোট আয়ের অর্দ্ধেকের বেশী এই ভাবে সামরিক খাতে উড়ে গেল। কিন্তু কেন? ভারতবর্ষের কারও দ্বারা আক্রান্ত হবার কোন সম্ভাবনা নেই—এ কথা পণ্ডিত নেহেরু স্বীকার করেছেন, দেশের মধ্যেও অশান্তি নেই। তবুও কেন এই বিরাট অপচয়? যে দেশের কয়েক কোটী বাস্তহারা পথে ঘাটে ঘুরে মরছে, দেশের শতকরা ৯০ ভাগ খেতে না পেয়ে, পরতে না পেয়ে পশুর মত জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে সে দেশে এই Gun before bread ফ্যাসিষ্ট পলিসি কেন? সোভিয়েটের মত প্রকাণ্ড দেশ, যাকে পিষে মারার জন্য অষ্ট প্রহর চেষ্টা করছে সাম্রাজ্যবাদীর শিবির, যার চারিদিকে হাজার হাজার যুদ্ধ ঘাঁটী গড়ে চলেছে যুদ্ধবাদীরা, সেও তার মোট আয়ের শত করা ২০ ভাগের বেশী সামরিক খাতে বরাদ্দ করেনি। যদি সোভিয়েট অন্য দেশ বলে আপত্তি ওঠে তাহলে নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলির উদাহরণ নেওয়া ভাল। চেকোশ্লোভাকিয়ায় মোট আয়ের শতকরা ৯ ভাগ, পোল্যাণ্ডে শতকরা ১০ ভাগ, বুলগেরিয়ায় শত করা ৭ভাগ ব্যয়িত হয় সামরিক খাতে। ভারতবর্ষের অর্থনীতি এদের চেয়ে লক্ষ্য-গুণ নড়বড়ে হলেও কেন এই বিরাট যুদ্ধ ব্যয় করা হচ্ছে? কারণ এ হল সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদীদের দস্তুর, শান্তির শিবিরের বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধা-বার চক্রান্ত, তার জন্য সামরিক প্রস্তুতি, সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের পায়ে ভারত-বর্ষের জাতীয় স্বার্থের বিসর্জন। ১৯৩৮-৩৯ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক খাতে যা খরচ করা হয়েছিল ১৯৫০-৫১ সালে তার ৫০ গুণ বেশী খরচ করা যে কারণে হচ্ছে ভারতবর্ষও ক্ষুধিত নিরন্ন বিবস্ত্র অজ্ঞ ভারতবাসীকে উপবাসী বস্ত্রহীন শিক্ষাহীন রেখে সেই একই কারণে যুদ্ধের প্রস্তুতির পেছনে এত বিরাট পরিমাণ অর্থ খরচ করা হচ্ছে।

যে সরকারের লক্ষ্য পুঁজিবাদী স্বার্থ রক্ষা সে সরকার জনতার স্বার্থের প্রতি মমত্বহীন। তাইতো সেচের অভাবে চাষী মরে গেলেও, ফসল শুকিয়ে গিয়ে দেশে প্রতি বছর দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি করলেও বাজেটে সেচ ব্যবস্থায় বরাদ্দ হয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা। যে দেশের প্রতি চারজন লোকের মধ্যে তিন জন কৃষির ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নির্ভরশীল সে দেশে এ ব্যয় ঠাট্টা ছাড়া কি বলা যেতে পারে। অন্যান্য বিষয়েও এই এক অবস্থা। শিল্পোন্নয়নের জমা মূলধনে ১০ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা, কয়েক কোটী উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের জন্য ১৬ কোটী টাকা। এর পাশাপাশি একবার সমাজতান্ত্রিক শিবিরভুক্ত দেশগুলির তুলনা করা উচিত। সোভিয়েট ইউনিয়নে কৃষি ও উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ হয়েছে মোট রাজস্বের শতকরা ২৭ ভাগ দেশ উন্নয়ন মূলক কাজে শতকরা ৪০ ভাগ। নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলিও এই পথ অনুসরণ করছে। শিল্প ও কৃষির উন্নতির জন্য চেকোশ্লোভাকিয়া বাজেটের মোট পরিমাণের শতকরা ৩২ ভাগ, পোল্যাণ্ড ৪৩ ভাগ, হাঙ্গেরী ৪১ ভাগ রুমানিয়া ৩৭ ভাগ, বুলগেরিয়া ৩৫ ভাগ, আলবেনিয়া ৩৭ ভাগ বরাদ্দ করেছে। তবুও নাকি ঐ সব দেশে যুদ্ধের জন্য উদগ্রীব আর ভারতবর্ষ শান্তিপ্রিয়।

এই সাম্রাজ্যবাদ তোষণ ও শোষণ-মূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই নতুন ট্যাক্স ধার্য্য করা হয়েছে। দেশমুখ সাহেব দম্ভ করে বলেছেন, তাঁর কাছে অবিচার নেই, ধনী দরিদ্র সকলের ওপরই তিনি সমানভাবে কর ধার্য্য করেছেন। তাঁর এই কথা হল কংগ্রেসী নেতাদের স্বভাবজাত ধাপ্পা দেওয়ার আর এক নমুনা। যে কোন অর্থনীতির ছাত্রই জানে যে, এমন কি খাস পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও progressive taxation এর নীতি অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ আয়ের মাত্রা যত বাড়ে করের হারও তত বাড়ে। এইটাই হল equity দেশমুখ সাহেবের গুরুনশাইদের মতেই। অথচ তা না করে ভারতীয় অর্থ সচিব সকলকে সমান ভাবে করভারে পীড়ন করে বড় বড় পুজিপতিদের রক্ষা করেছেন। তার পর যে জিনিষগুলির ওপর কর ধার্য্য করা হয়েছে তার দিকে তাকালেই বোঝা যায় কোপটা তাঁর জন-সাধারণের ওপর। তিনি বিড়ি, সিগারেট নস্য, তামাকের ওপর কর চাপিয়েছেন, অর্থ সচিবের এক আঘাতেই বিড়ি শিল্প যায় যায় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় কোপ হল সুপারি ও কেরোসিনের ওপর। গরীব জনসাধারণ আধপেটা খেয়ে একটা পান খাবে কিংবা ইলেকট্রিক্ আলোর অভাবে কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে অন্ধকার কাটাবে—এসব হল মন্ত্রী মশাই এর কাছে বিলাসিতা, সুতরাং তার ওপর ট্যাক্স চাপান হল। সর্বশেষ হল কয়েকটি পণ্যবাদে সমস্ত আমদানী করা মালের ওপর শুল্ক শতকরা ৫ ভাগ হারে। চমৎকার ব্যবস্থা বলতে হবে! এ না করে, জনতাকে ট্যাক্সের চাকার তলায় পিষে না মেরে কি মোটা টাকা আয়ের ওপর আয়কর বাড়ানো যেত না? মোটা লাভের ওপর Excess profit Tax চড়ান চলত না? বড় বড় সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবার ক্ষেত্রে death duty বসালে ক্ষতি হত? বিদেশী কোম্পানীদের ওপর বিশেষ কর ধার্য্য করা যেত না? যেত সবই, যায় ও। কিন্তু তা করতে হলে যে সরকারের দরকার কংগ্রেসী সরকার তা নয়, তাই জনতার গলায় ছুরী চালাতেই সে সিদ্ধহস্ত, ধনীর পকেট ভর্ত্তির কাজে।

দুর্গাপুর ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের সভায় অগ্রগতি সংঘ গঠন

গত ৪ঠা মার্চ সাপুর দুর্গাপুর বাস্তু-হারা ক্যাম্পে একটি সাধারণ সভা হয়। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে "অগ্রগতি সংঘ" নামে একটি প্রগতিশীল ক্লাব গঠন করা হয়, ক্লাবের উদ্দেশ্য হবে, (১) স্থানীয় সামাজিক কার্য্য করা, (২) ছেলে মেয়েদের নিয়মিতভাবে পড়াশুনার জন্য একটি ছোট স্কুল করা, (৩) একটি লাইব্রেরী গঠন করা (৪) চিকিৎসার ব্যবস্থা করা (৫) ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার বন্দোবস্ত করা। (৬) নিয়মিতভাবে প্রগতিশীল পত্রিকা পড়াশুনা করা। সভায় নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিদের নিয়া এ বৎসরের জন্য কার্য্যকরী সমিতি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গঠন করা হয়।

সভাপতি—ফটিক ঘোষ
সহঃ সভাপতি—শ্যামল দত্ত
যুগ্ম সম্পাদক—শান্তিপদ দাস
বিজয় গুহ

কার্য্যকরী সমিতির সভ্য—
(১) গনেশ বসু রায়
(২) অমল দত্ত, প্রভৃতি

নয়া চীনের কৃষি সংস্কার

আই আলেকজান্দ্রোক

বিগত কয়েক শতাব্দীতে চীনা কৃষক সমাজের অবস্থা এক কথায় বলা যায়: জমির দুর্ভিক্ষ ও নিষ্ঠুর সামন্ততান্ত্রিক শোষণ।

চীনের মোট আয়তন ১ হাজার ৪ শ ৩৯ কোটি মু (১মু=⅙ একর; ১একর =কিঞ্চিদধিক ৩ বিঘা।) তন্মধ্যে ২৪০ কোটি মু জমি আবাদযোগ্য। কুয়োমিন্টাং আমলে যুদ্ধের (১৯৩১-৩৬) আগে পর্য্যন্ত মাত্র ১ শ ৪৭ কোটি মু জমিতে চাষাবাদ হত। তারও মধ্যে মাত্র শতকরা ২০ ভাগ জমির মালিক ছিলেন দরিদ্র ও মধ্য শ্রেণীর কৃষকরা। অথচ তাঁরাই হচ্ছেন পল্লীবাসীদের শতকরা ৯০ জন। সরকারী তথ্য দৃষ্টে জানা যায়, জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধার সময় ২০টি প্রদেশে (মাঞ্চুরিয়া ও জেহোলবাদে) পল্লীঅঞ্চলের পরিবারের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৪৫ লক্ষ ৮১ হাজার। তন্মধ্যে শতকরা ৩৩টি পরিবারের কোনো জমি ছিল না, শতকরা ২৬টি পরিবারের জমির আয়তন ·৭ হেক্তারেরও কম, শতকরা ১৮টি পরিবারের জমি ১·৩ হেক্তারের চেয়ে বেশী নয়, শতকরা ৯টি পরিবারের জমির আয়তন ২ হেক্তার এবং শতকরা মাত্র ১৪টি পরিবারের জমি ছিল ২ হেক্তারের বেশী। শেষোক্ত দলের মধ্যে আছেন আবার জমিদার ও জোতদার। তাঁরা জমি ইজারা দিতেন। এঁরা শতকরা ৮টি পরিবার মাত্র। অথচ এঁদেরই হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল সমস্ত আবাদী জমির শতকরা ৭০ ভাগ।

জমিদার ও জোতদার শ্রেণীর কাছ থেকে জমি ইজারা নিতে গিয়ে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকরা দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতেন। খারাপ জমির জন্যেও তাদের দিতে হত ফসলের অর্দ্ধেক। ভালো জমির জন্যে দিতে হত তিন ভাগের দু-ভাগেরও বেশি। এর উপর কৃষক-কুল ঋণজালে জর্জ্জরিত হয়েছিলেন। এক বছরের মধ্যে কৃষকদের ঋণের যে পরিমাণ সুদ দাঁড়াত, তা ঋণের আসল পরিমাণের দ্বিগুণ, কি তারও বেশি। ১৯৪৬ সালে কুয়োমিন্টাং-শাসিত ১৫টি প্রদেশে শতকরা ৬০টি কৃষক পরিবার তাদের আসল ঋণের আড়াই গুণ ঋণভারে আটক পড়েছিল জমিদার শ্রেণী ও কুয়োমিন্টাং ব্যাঙ্কগুলির কাছে। এই ব্যাঙ্কগুলির মালিক হচ্ছে "চার পরিবার।" শতকরা ৩১টি কৃষক পরিবার তাদের সমস্ত ফসল বা সমস্ত জমি মর্টগেজ দিতে বাধ্য হত। অজন্মার বছরে ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে তখন তাঁদের জমি ও ফসল কুক্ষিগত করত জমিদার শ্রেণী ও "চার পরিবারের" ব্যাঙ্কগুলি। সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, কৃষকদের শতকরা ৫০ ভাগ ঋণিই দিত চিয়াংকাইশেক, কুং-সিয়াং-সি, সুং-সি-ওয়েল ও চেং ভ্রাতৃবর্গ এই চার পরিবারের ব্যাঙ্কগুলি। এতেই দুর্দ্দশার সব নয়। এর উপর ছিল ১৮০টির ও বেশি সরকারী কর, নজরানা ও বাধ্যতামূলক বেগার খাটুনি।

চীনের ইতিহাসে জমি ও স্বাধীনতার জন্যে চাষী জনগণের বহু আন্দোলন লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু শুধুই কৃষক আন্দোলন বলে সে সবই শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। একমাত্র গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার ফলেই চীনের কৃষক সমাজ সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা ও মালিকানাসত্ব এবং কর-ভার, ঋণভার ও অন্যবিধ দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করেছে। ঐ বিপ্লবে চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি পরিচালিত শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে একযোগে বিদ্রোহ করেছে কৃষক শ্রেণীও। সেই সংগ্রাম সমগ্র চীনের জাতীয় স্বাধীনতা, স্বাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

১৯৫০ সালের জুন মাসে চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্তৃক রচিত ও কেন্দ্রীয় লোকায়ত্ব সরকার কর্তৃক গৃহীত কৃষি সংস্কার আইন সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধিরই সহায়ক। এই কৃষি সংস্কার আইনের একাংশে আছে: "জমিদার শ্রেণীর সামন্ততান্ত্রিক শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত ভূমি-ব্যবস্থার এতদ্বারা অবসান ঘটানো হচ্ছে এবং তৎ পরিবর্ত্তে প্রবর্তিত হচ্ছে জমির উপর কৃষকদের মালিকানা সত্ব। এই আইনের লক্ষ্য হচ্ছে কৃষির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির অনুকূল স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি এবং নবীন চীনের শিল্পোন্নয়নের ভিত্তি তৈরী করা।"

কৃষি সংস্কার আইনে জমিদারের জমি বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে। গীর্জা, মঠ, মন্দির ইত্যাদির সম্পত্তিভুক্ত জমি; পল্লী অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের ও মিল-মালিকদের জমি; অন্যান্য পেশা আছে এমন সব লোকের অথবা স্থানীয় গড়পড়তা মাথাপিছু জোত-দারির দ্বিগুণ পরিমিত যারা ইজারা দেন তাদের জমি এবং আধা জমিদার ধরণের ধনী কৃষকদের ইজারা দেওয়া জমি—এ সবই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এ সব জমি হয়েছে কৃষকদের সম্পত্তি। তবে এ জমি তারা বেচে দিতে বা ইজারা দিতে পারিবেন না। উক্ত আইনের বলে জমিদারদের শস্যভাণ্ডার, পশুসম্পদ, চাষাবাদের যন্ত্রপাতি, উদ্বৃত্ত বাড়ীঘর ইত্যাদি সবই কৃষকদের করায়ত্ত হয়েছে। জমিদার ও প্রতিক্রিয়াশীল জোতদার শ্রেণীর গোপন চক্রান্ত ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চীনের লোকায়ত্ত গভর্ণমেণ্ট কঠোর হস্তে দমন করছেন। কৃষি-সংস্কারের শত্রুদের সম্পর্কে তারা নিষ্করুণ।

উত্তর পূর্ব চীন (মাঞ্চুরিয়া), উত্তর চীন এবং পূর্ব ও মধ্য চীনের (শান্টুং, কিয়াংসু ও হোনান প্রদেশে) সাড়ে চৌদ্দ কোটি লোক—অধ্যুষিত সুবিশাল পল্লী অঞ্চলে ইতিমধ্যেই কৃষি সংস্কারের কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। এই ভূখণ্ডের ৩ কোটি ৭০ লক্ষ হেক্তার জমি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে।

এ বছর ও আগামী বসন্ত কালে কৃষি-সংস্কার চালু করা হবে উত্তর-পশ্চিম চীন (শানসি, শেন্‌সি কানসু), পূর্ব চীন (চেকিয়াং, আনহোয়ে, দক্ষিণ কিয়াংসু, ফিকিয়ান) এবং মধ্য চীনের (হুপে, হুনান) প্রদেশগুলির ১০ কোটি লোক অধ্যুষিত বিশাল অঞ্চল জুড়ে। ১৯৫২ সালের বসন্ত কালের মধ্যে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম চীনের ১৭।১৮ কোটি লোক অধ্যুষিত এলাকায় কৃষি-সংস্কারের কাজ সাঙ্গ হবে। জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি যে সব অঞ্চলে থাকে সেখানে সংস্কারের কাজে হাত দিতে কিছু কাল দেরি হবে। কিন্তু এই সব অঞ্চলেও ইতিমধ্যেই জমির খাজনা অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে; ঋণ ও তার সুদের বোঝা অনেকখানি হালকা করা নয়—একেবারে মকুব করে দেওয়া হয়েছে; এক ন্যায়সঙ্গত কর ধার্য্য করা হয়েছে। চীনের এই অংশে কৃষি সংস্কার প্রবর্ত্তনের ব্যাপক উদ্যোগ আয়োজন চলছে। সর্বত্র কৃষক সমিতি (লীগ) গঠিত হচ্ছে। মধ্য ও দক্ষিণ চীনে ২৪ লক্ষ কৃষক এবং দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে ৫০ লক্ষ কৃষক এই লীগে যোগদান করেছেন।

কৃষি-সংস্কারের সুফল পেতে বেশি খুব দেরি হবে না। কৃষকরা এখন জোত-জমির মালিক। জীবনে এই প্রথম তাঁরা নিজেদের স্বার্থে জমি চাষ করছেন। অত-এব ফসলের উৎপাদন যে দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

অনাবাদী নতুন জমিতে লাঙল চালানোর ফলে আবাদী জমির আয়তন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিকার্য্যও উন্নত-তর হয়েছে। গত বছরের চীনের শস্য উৎপাদনের মোট পরিমাণ তৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের চেয়ে ৫০ লক্ষ টন বেশি হয়েছে। তন্মধ্যে গমের পরিমাণ হয়েছে ৩৩ লক্ষ টন বেশি। একমাত্র উত্তর পশ্চিম চীনেই পরিকল্পনার চেয়ে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন বেশি হয়েছে। তুলার উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৃষকরা দলে দলে সমবায় প্রতিষ্ঠান-গুলিতে যোগদান করছেন। সমবায়ের শক্তি দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। কৃষক সমাজ ও রাষ্ট্রকে সমবায় আন্দোলন অপরিমেয় সাহায্য দিচ্ছে। চীনের লোকায়ত্ত প্রজাতন্ত্রে ইতিমধ্যেই সমবায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সহর অঞ্চলে ৩ হাজার ৬শ এবং পল্লী অঞ্চলে ৩৫ হাজার। তাদের মোট সভ্য সংখ্যা হবে ২ কোটির কাছাকাছি।

কৃষি-সংস্কার চালু হওয়ায় চীনা কৃষকদের ব্যবহারিক জীবনের সুস্পষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে। কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। আভ্যন্তরীণ বাজার প্রসারিত হচ্ছে। কারখানাজাত পণ্যদ্রব্যের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে চীনের শ্রমশিল্পের দ্রুত উন্নতির উপযোগী অবস্থা সৃষ্ট হচ্ছে। আভ্যন্তরীণ বাজারের ক্রম-বর্ধমান প্রসারের ফলে এবং কৃষির দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চীনের শ্রমশিল্প আজ কাঁচা-মাল সরবরাহের মজবুত ভিত্তি পেয়ে যাচ্ছে।

কৃষি-সংস্কার চীনের কৃষক সমাজকে কেবল জমিদার ও জোতদারের সামন্ত-তান্ত্রিক দাসত্বের শৃঙ্খল থেকেই মুক্ত করেনি কেবল কৃষকদের জীবন যাত্রার উন্নতি সাধনেই তার সুফল সাঙ্গ হয়ে যায়নি, কৃষি-সংস্কার চীনের দ্রুত শিল্পায়নের পথ সহজ ও সুগম করে দিয়েছে—যন্ত্র যুগের এক অনগ্রসর কৃষি সর্ব্বস্ব দেশকে কৃষি ও শ্রমশিল্পের সুষ্ঠ ভারসাম্য সম্বলিত এক উন্নত দেশে পরিণত করার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।—(টাস্)

★ মালয়ের অপরাজেয় মুক্তি সংগ্রাম ★

মালয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের রক্ত-স্রাবী ঔপনিবেশিক যুদ্ধের তিন বছর চলছে। সাম্রাজ্যবাদীরা সকল রকম হিংস্র পন্থা অনুসরণ করেও মালয়ের জনগণকে দমাতে পারছেন না। মালয়ের গণ-সংগ্রাম ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে। পরাজয়ের পর পরাজয় ঘটছে বিদেশী শোষকদের। তাই মালয়ের বৃটিশ বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ব্রিগ্‌স নিরুপায় হয়ে বৃটিশ শ্রমিক মন্ত্রিসভার কাছে ১ লক্ষ ৪০ হাজার আঘাত-জর্জ্জরিত বৃটিশ সৈন্যের সাহায্যের জন্যে নতুন সৈন্য-বল ও সমরোপকরণ চেয়ে পাঠিয়েছেন। ঔপনিবেশিক দপ্তরের কাছে তাঁর রিপোর্টে ব্রিগ্‌স্ স্বীকার করেছেন, বিদ্রোহীদের দমন করার জন্যে অগৌনে অত্যাবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বিত না হলে মালয় বৃটেনের হাত ছাড়া হবে।

মালয় হাতছাড়া হতে পারে এ সম্ভাবনার কথা ভাবতেও ভয় পান বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাঁদের অতলান্তিক সাগরের ওপারের প্রভুরা। কেননা তাঁদের সর্ব্বগ্রাসী সামরিক পরিকল্পনায় নৌ-ঘাঁটি ও কাঁচা-মাল সরবরাহের কেন্দ্র হিসেবে মালয় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। অকৃত্রিম রবার উৎপাদনের ক্ষেত্রে মালয় পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। দুনিয়ার টিন সম্পদেরও একটা মোটা অংশই রয়েছে মালয়ে। ইন্দোনেশিয়া, চীন ও অষ্ট্রেলিয়ায় গমনাগমণের পথ নিয়ন্ত্রণ করছে মালয়। এহেন মালয়কে মার্কিন—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে এবং সোবিয়েত রাষ্ট্র ও গণতান্ত্রিক চীনের বিরুদ্ধে এক প্রধান ঘাঁটি করতে চান।

মালয়ে মার্কিন-বৃটিশ পরিকল্পনা সফল হচ্ছে না। কোরিয়ার জনগণের বীরত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে মালয়ের দেশভক্তরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উপর আঘাতের পর আঘাত করছেন। "ডেলি টেলিগ্রাফ এণ্ড মর্ণিংপোষ্ট" পত্রিকা বিক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছেন, মালয়ের দেশভক্তরা বৃটিশ অভিযানের গতি রোধ করে দিয়েছেন এবং মালাক্কা ছাড়া আর কোনো অঞ্চল থেকে গেরিলাদের বিতাড়িত করা সম্ভব হয় নি। মালয় ফেডারেশনের রাজধানী কুয়ালালামপুর থেকে রয়টারের প্রতিনিধির প্রদত্ত সংবাদের মধ্যে সুস্পষ্ট আতঙ্ক প্রকাশ পেয়েছে। উক্ত সংবাদদাতা লিখেছেন, মালয়ের গণবাহিনীর সংখ্যাশক্তি কতখানি কেউ তা জানে না, কিন্তু একথা কারো অজানা নেই যে, গত দু'বছর ধরে তাদের চেয়ে ঢের বেশী সুসজ্জিত বৃটিশ সৈন্যবাহিনীকে তারা তটস্থ অবস্থায় রেখে দিয়েছেন। বৃটিশ সংবাদপত্র সমূহের এই জাতীয় খবর থেকে বেশ বোঝা যায়, সাম্রাজ্যবাদীরা আধুনিক রণসজ্জায় যতই সুসজ্জিত হক না কেন মুক্তিকামী মালয়ী জনগণের দৃঢ় সঙ্কল্প তারা কিছুতেই ভাঙ্গতে পারবেন না। সমগ্র জনগণের সমর্থন পুষ্ট মালয়ী গণবাহিনী সাম্রাজ্যবাদের সৈন্যবাহিনীকে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে বহুস্থানে হটে যেতে বাধ্য করেছেন। বৃটিশ ও মার্কিন পুঁজিপতিদের স্বার্থে ইতিমধ্যেই ১২ হাজার বৃটিশ সৈন্য প্রাণ দিয়েছে।

মালয়ের দেশভক্তদের প্রতিরোধ দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি জেনারেল ব্রিগ্‌স স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, গত বছরের তুলনায় বিদ্রোহীদের সংখ্যা শক্তি বেড়েছে এবং রণনীতির ব্যাপারে তাঁরা আরো বেশী অভিজ্ঞতা-পুষ্ট হয়েছেন। বৃটিশ সরকারী তথ্যেই প্রকাশ, তৎপূর্ব্ববর্তী বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসের ৮২টি সংঘর্ষের তুলনায় গত সেপ্টেম্বরের সংঘর্ষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৫৮টি। গত বছরের আট মাসে গেরিলা বাহিনী রেলপথের উপর ১৮৩ বার হানা দিয়ে সমরাস্ত্র ও রপ্তানীর কাঁচা মাল বোঝাই ২৬ খানি ট্রেণ ধ্বংস করে দিয়েছেন। গেরিলা তৎপরতার জন্যে এ বছরের সুরু থেকে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কুয়ালালামপুর ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে রাত্রিকালে রেল চলাচল একেবারে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

জনগণের প্রতিরোধের জবাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নগ্ন ফ্যাসিষ্ট নির্য্যাতনের পথ বেছে নিয়েছেন। বৃটিশ হাই কমিশনার হেনরী গার্ণে এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, পাইকারী দণ্ড ও বলপূর্ব্বক খাটানোর পন্থা অনুসৃত হবে। এখন থেকে সহরের কোন পাড়ায় বা কোনো গ্রামে গেরিলার সন্ধান পেলে সেই পাড়া বা সেই গ্রামের সমস্ত অধিবাসীকে দায়ী করে তাদের কঠোর সাজা দেওয়া হবে। বৃটিশ শোষকরা গোটা মালয়কে এক অন্ধকারায় পরিণত করেছেন। বৃটিশ 'শ্রমিক' সরকারের অনুমোদনপুষ্ট ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ কারাগারের অভ্যন্তরে পাইকারী ধ্বংসের ব্যবস্থা করেছেন—প্রহারে, নির্য্যাতন, বিষপ্রয়োগ ইত্যাদি।

মুক্তি বাহিনীকে ধ্বংস করতে অপারগ হয়ে মার্কিন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এখন নগ্ন ফ্যাসিষ্ট ত্রাসের রাজত্ব চালু করেছেন। স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ বিসর্জ্জনে কৃতসংকল্প জনগণকে নতি স্বীকার করাতে পারবে না কোনো ফ্যাসিষ্ট তাণ্ডবলীলা, কোনো অতি আধুনিক সমরাস্ত্র।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সম্মুখে অপেক্ষা করছে আরো তীব্র আরো প্রবল প্রতিরোধ-সংগ্রাম। মালয়ের জনগণ জানেন, পরিণামে তাঁদেরই জয় হবে। সমগ্র প্রগতিশীল দুনিয়ার সহানুভূতি ও সমর্থন তাঁরা পাচ্ছেন। সেই শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন মনুষ্য সমাজের কথাই ধ্বনিত হয়েছে ওয়ারস কংগ্রেসের শান্তি সেনানীদের কণ্ঠ থেকে: "কোনো জাতিকে পরাধীনতা বা ঔপনিবেশিক নির্য্যাতনের শৃঙ্খলে বাঁধবার চেষ্টাকে আমরা বিশ্ব-শান্তির পক্ষে মারাত্মক বিঘ্ন বলে মনে করি। এই সব নিপীড়িত জাতির স্বাধীনতার অধিকার আমরা ঘোষণা করছি।"

ঘাটশীলায় বিরাট কৃষক সমাবেশ

জোরদার সংগঠন গড়ে তোলার সংকল্প

(সংবাদদাতার পত্র)

গত ৬ই মার্চ্চ সিংভূম জিলার ঘাটশীলা থানার অন্তর্গত গন্ধনিয়া হাটে সোন্তালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার ও যুক্ত কিষাণ সভার উদ্যোগে খাদ্য বস্ত্র সমস্যা ও কিষাণদের অবস্থা নিয়ে এক বিরাট কৃষক সমাবেশ হয়। সভাপতিত্ব করেন সোন্তালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বিশিষ্ট সদস্য ও কিষাণ নেতা কমরেড হীরেন সরকার। কিষাণ সংগঠক কমরেড কৃষ্ণা চোবে বলেন যে "বর্ত্তমান কংগ্রেসী সরকার মানে টাটা বিড়লার সরকার অর্থাৎ পুঁজিপতি, জমিদার ও জোতদারদের সরকার। বিদেশী সরকারের সাথে রফা করে ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়ে বিজয়ী হয়ে আজ আপনাদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে বসেছে।" তিনি আরও বলেন যে "বৃটীশের আমলে আপনাদের জঙ্গলের যে অধিকার ছিল বর্ত্তমান কংগ্রেসী সরকারের আমলে তা হ'তে আপনাদের বঞ্চিত করেছে অর্থাৎ রিজার্ভ করে নিয়েছে উপরন্তু আপনাদের কাঠ, দাঁতন, পাতা ছেঁড়ার ও নেবার মিথ্যা অজুহাতে মামলা দায়ের করে হয়রাণী করা ও শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। ঘরের চারি সীমানায় রিজার্ভ ফরেষ্ট। এই জুলুমের বিরুদ্ধে যুক্ত কিষাণ সভার পতাকা তলে এসে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলুন।"

কমরেড সভাপতি শ্রেনী স্বার্থের কথা বলে, বলেন যে "এক রাষ্ট্র দুই শ্রেনী স্বার্থ নিয়ে চলতে পারে না। বর্ত্তমান রাষ্ট্র পুঁজিপতিদের রাষ্ট্র আপনাদের স্বার্থ দেখবেনা।" স্থানীয় অভাব অভিযোগের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে "কংগ্রেসীরা মাঝে মাঝে আপনাদের দাবী পূরণ করবে বলে ধোকা দিয়ে যায়, সেই সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন।"

খাদ্য ও বস্ত্র সম্বন্ধে সভাপতি বলেন "গরীব চাষীদের উলঙ্গ রেখে সরকার শতকরা ৪০ভাগ পর্য্যন্ত কাপড় বিদেশে পাঠাবার অনুমতি দেয়। আপনাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর ট্যাক্সের মাত্রা বাড়িয়ে শোষণে জর্জ্জরিত করে তুলেছে অথচ এদিকে চাষের যন্ত্রপাতি গরীব চাষীদের মধ্যে বিলি করা, জলের জন্য বাঁধ করে দেওয়া, সেচের সুবন্দোবস্ত করার কোন চেষ্টা নেই। এই তো কংগ্রেসী সরকারের চাষী দরদ। সুতরাং যে গভর্ণমেণ্ট ও রাষ্ট্র পুঁজিপতি জমিদার জোতদার ও চোরাবাজারীর স্বার্থে পরিচালিত হয়, জনতাকে খাদ্য বস্ত্র চাষের সুবিধা করে দিতে পারে না সেই পুঁজিপতি রাষ্ট্র উচ্ছেদ করে, জনস্বার্থে জনরাষ্ট্র কায়েম করার জনতার পূর্ণ অধিকার আছে। যত দিন পর্য্যন্ত পুঁজিপতি শ্রেণীর রাষ্ট্র থাকবে ততদিন পর্য্যন্ত মেহনতকারী জনতার উপর শোষণ ও অত্যাচার চলতেই থাকবে। এক মাত্র সমাজতন্ত্রেই জনতার মুক্তি মিলবে। সুতরাং সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মারফৎ প্রতিরোধ করুন এবং সংগ্রামশীল সংগঠন গড়ে তুলুন।" গ্রামে গ্রামে যুক্ত কিষাণ সভার কমিটি ও গণ কমিটি গড়ে তুলবার আহ্বান জানাইয়া সভার কাজ শেষ হয়।

জনতাকে উলঙ্গ রাখার কংগ্রেসী নীতি

দেশে কাপড় নেই অথচ ৬১ কোটী টাকার কাপড় রপ্তানী

মিল মালিকের স্বার্থে আরও দাম বৃদ্ধি

কংগ্রেসী রাজত্বে প্রতিটি বিষয়েই সঙ্কট দেখা দিচ্ছে শুধু কলওয়ালা আর জমিদারদের লাভ লোঠা বিষয় ছাড়া। ভারতবর্ষে খাদ্য সমস্যা চুড়ান্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। মহাচীন হতে চাল পাওয়া যায় পাটের বদলে, মণ প্রতি চালের দাম পাঁচ টাকার মত পড়ে, জাহাজ প্রভৃতির হাঙ্গামাও পোহাতে হয় না তবুও কংগ্রেসী খাদ্যমন্ত্রী তা নেবে না। সোভিয়েট হতে গম পাওয়া যায় আমাদের যে কোন কাঁচা মালের বদলে। সোভিয়েট ইউনিয়ন বলেছিল চায়ের বদলে গম দিতে পারে, ভারতবর্ষে চায়ের অভাব নেই কিন্তু চা বাগানের শতকরা ৮০ ভাগের মত আজও ইংরাজ ব্যবসায়ীদের কবলে, তাই বাঁচার জন্য যে গম দরকার তাও মিলবে না চায়ের বদলে। তারপর সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়, ভারতবর্ষের যে কোন কাঁচামালের বদলে তারা গম দিতে প্রস্তুত। এ ব্যাপার অনেকদিন আগেই ঠিক হয়েছে; শ্রীমতী বিজয়লক্ষী তখন মস্কোতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। সে গম না নিয়ে আমেরিকার কাছে ভিক্ষা চাওয়া হচ্ছে। এসবের উদ্দেশ্য দেশে কৃত্রিম খাদ্যাভাব সৃষ্টি করে চোরাকারবারীদের মুনাফা লুটতে সাহায্য করা।

খাদ্যের বেলায় যে নীতি বস্ত্রের বেলায়ও তাই। কলওয়ালাদের এমনিতেই কোটী কোটী টাকা মুনাফা হচ্ছে। তাতে তারা খুশী নয় তাই সরকারের কাছে তাদের আব্দার হল, বিদেশে কাপড় রপ্তানীর সুবিধা বাড়িয়ে দিতে হবে। কংগ্রেসী সরকারের সঙ্গে মিলওয়ালাদের ষড়যন্ত্র পাকা হয়ে গেল, ফলে ১৯৪৯সালে মার্চের কাছা কাছি সময়ে যে বস্ত্র উৎপাদিত হয়েছিল তা দ্রুতগতিতে বিদেশে রপ্তানী করা হতে লাগল। দেশের প্রয়োজনের তুলনায় কাপড় সামান্য হয়ে যাবার পরও চলল এই রপ্তানী। গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী বোম্বাইএর টেক্সটাইল বিভাগের একজন কর্ম্মকর্ত্তা বলেছেন যে, ১৯৫০ সালে ভারতবর্ষ যে পরিমাণ কাপড় রপ্তানী করেছে তাতে জাপানও পেছিয়ে [illegible] টেবিল ক্লথ, প্রভৃতি জাতের কাপড় ছেড়ে দিয়েও ১২০ কোটী গজ কাপড় রপ্তানী হয়েছে। এ ছাড়াও ৮ কোটী ১২লাখ পাউণ্ড সুতা অর্থাৎ ৪০ কোটী গজ কাপড় রপ্তানী হয়েছে। ভারতের বস্ত্র উৎপাদন এখন ৪০০ কোটী গজের মত। তার অর্দ্ধেক রপ্তানীতে বেরিয়ে গেল। প্রতি বছরই এই রপ্তানী পরিমাণ বেড়েই চলেছে। দেশের লোক যখন খেতে পায় না, তখন পুঁজিপতিদের লাভের জন্য খাবার ও কাপড় রপ্তানী বেড়েই চলে—এ হল পুঁজিপতিদের দস্তুর। ১৯৪৯ সালে কাপড় রপ্তানী যেখানে ছিল ২৬, ২৩, ৫৪, ৪১৮ টাকা ১৯৫০ সালে তা বেড়ে হয় ৬০, ৯৮, ৬৪, ০৮৭ টাকা।

শুধু তাই নয় দেশে যদি কাপড়ের অভাব হয়ে থাকে তাহলে বিদেশ থেকে কাপড় আনার ব্যবস্থা করতে হয়। অথচ তা করার বদলে তার বিপরীতটাই করা হয়েছে। বিদেশী কাপড়ের ওপর উচ্চ হারে শুল্ক বসানো আছে। সুতরাং কংগ্রেসী সরকার ও কাপড়ের কলের রাজারা রপ্তানীর মারফৎ মোটা লাভের ব্যবস্থা করল বিদেশে এবং দেশে কাপড় আমদানী বন্ধ করে লাভের মাত্রা বাড়িয়ে দিল।

ভারতবর্ষে কাপড়ের কি রকম অভাব তা পশ্চিম বাংলা পরিষদে প্রশ্নোত্তর কালে জানা গিয়েছে। পশ্চিম বাংলায় মাসে যেখানে প্রয়োজন ১৮ হাজার বেল সেখানে ৩১৭০ বেল কম আসছে। যুদ্ধের আগে ভারতবর্ষের জনপ্রতি কাপড়ের ব্যবহার ছিল ১৭ গজের মত আজ তা কমে দাঁড়িয়েছে ১০ গজে। এই দশ গজের হিসাবের চেয়েও আবার কম কাপড় দেওয়া হচ্ছে। কাপড় বিক্রীর অনুমোদিত দোকানগুলির সামনের ভিড় লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় কি অবস্থা।

দেশবাসীর একান্ত প্রয়োজনীয় কাপড় রপ্তানী করা হচ্ছে বিদেশে আর তার বদলে যে সব জিনিষ আসছে তা ট্রেড রিপোর্ট হতে জানা যায়। আমদানী হচ্ছে চাটনি, টিনের মাছ, কাজু বাদাম রেসের ঘোড়ার দানা ইত্যাদি। এ জিনিষগুলির আমদানী বেড়েই চলেছে। ১৯৪৮ সালে ঘোড়ার দানা যেখানে আমদানী হয়েছিল ৭,২৫,১২১ টাকার ১৯৫০ সালে তা হয়েছে ৪৪, ৪৪, ১৪০ টাকার। মানুষকে না খাইয়ে উলঙ্গ করে রেখে রেসের ঘোড়ার খাওয়াবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কোটীপতিদের রেসের ঘোড়ার দাম মানুষের জীবনের চেয়ে বেশী কংগ্রেসী বড় কর্ত্তাদের কাছে।

কেনেডি বিড়লা সুরজমল গোষ্ঠির স্বার্থে

● পাটের দাম বিনিয়ন্ত্রিত ●

চোরাকারবার চালিয়ে ১০০ কোটী টাকা লাভ

তবুও শাস্তি হয় না

★ চোরাকারবারী দরকে আইনী করা ★

ভারতবর্ষের দেশী ও বিদেশী পাট কল মালিকরা পাট নিয়ে যে চোরাকারবার চালাচ্ছিল বহু টাল বাহানার পর ভারত সরকার তাকে প্রতিরোধ করার অভিনয় করল পাট ও পাটজাত-দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু যে সরকার তার ইজ্জত বিকিয়ে দিয়েছে দেশী ও বিদেশী পুঁজিপতিদের কাছে, যার একমাত্র লক্ষ্য হল ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা সে সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রথা যেমন হয় এক্ষেত্রেও তাই হল। সরকারের নাকের ডগার ওপরে চোরাকারবার চালাতে লাগল কেনেডি বিড়লা গোয়েঙ্কা সুরজমল [illegible] দল, বড় খবরের কাগজে এ চোরাকারবারের সংবাদ প্রকাশিত হল। সরকার পক্ষও জানল কয়েকমাসে পাটের কল মালিকরা ১৫০ কোটী টাকা লাভ করেছে, সরকারের কর ফাঁকি দিয়েছে এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ আদেশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছে। তবুও কেন্দ্রীয় সরকার এই সব কালোবাজারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সাহস করল না।

সরকার কাঁচা পাটের দর বেঁধে দিয়েছিল ৩৫৲ টাকায়; বিড়লার ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখল কাঁচাপাট ৪৫৲ কিনলেও অসুবিধার কারণ নেই। অসুবিধার কারণ থাকবে কি করে? পাটজাত দ্রব্যের নিয়ন্ত্রিত দামের বহু বেশী দামে পাট বিক্রী করা হচ্ছিল। 'সত্যযুগ' [illegible] ৪০ ইঞ্চি × ১০ ইঞ্চি হেসিয়ানের নিয়ন্ত্রিত দাম যেখানে ৫৫৲ সেখানে বাজারে তাকে ১০০৲ করে বিক্রী করা হচ্ছিল।

এই বেআইনি কারবারের বিরুদ্ধে ভারত সরকার একটি কথাও উচ্চারণ না করে পাট কল মালিকদের চোরাকারবারি দামকে আইনি দামে পরিণত করেছে। বেশ কয়েক দিন ধরে এই সব দেশী বিদেশী মালিকরা পাকিস্তানের মুদ্রার বাট্টা হার মেনে নেবার জন্য ভারত সরকারের ওপর চাপ দিচ্ছিল এবং পাটের দাম বিনিয়ন্ত্রিত করার জন্য দাবী করছিল। তারা পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিল তদের দাবী মেনে না নিলে পাটকলগুলি তারা বন্ধ করে দেবে। বোম্বাইএর কাপড়ের কলওয়ালারা মিল বন্ধের ভয় দেখিয়ে কাপড়ের দাম বাড়িয়ে নিয়েছে। বাংলার পাট কলওয়ালারাও সেই একই পথ অনুসরণ করে ভারত সরকারকে দিয়ে পাটের দাম বিনিয়ন্ত্রিত করিয়ে নিল।

সরকারের এই আদেশকে ইংরাজ ব্যবসাদারদের মুখপাত্র ওয়াকার অভিনন্দন জানিয়েছে এবং ভারত সরকারকে উপদেশ দিয়েছে যে কোন রকমে ভারতে পাট চাষ বাড়াতে। তাদের এ আব্দার ভারত সরকার ইতিমধ্যেই রক্ষা করেছে ধানী জমিতে ধানের বদলে পাট চাষ করিয়ে। দেশের লোক খেতে না পেলেও দুঃখ নেই, পাটের রাজারা মুনাফা লুঠতে পারলেই হল। ভারতবর্ষের বুকের ওপর বসে ইংরাজ ব্যবসায়ীর দল ভারতীয় কোটীপতিদের সহযোগিতায় দেশবাসীকে শোষণ করে চলেছে, সরকারের আদেশকে অগ্রাহ্য করছে, ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে, চোরাকারবার চালাচ্ছে আর হুঙ্কার দিয়ে বলছে—"ভারতবর্ষের সুতা কল মালিক ও কাগজ প্রস্তুতকারকরা যখন ভারতবাসীর গলা কাটছে, তখন আমরাও কাটব" আর "স্বাধীন" কংগ্রেসী সরকার আদেশকে পদলেহন করে তাদের আদেশ শিরোধার্য্য করে চলেছে। এরই নাম কংগ্রেস মার্কা স্বাধীনতা।

পড়ুন

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের

ইংরাজী মুখপত্র

Socialist Unity

৪৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩

গণদাবী

রেজিঃ নং সি ৩২৫৩

সোভিয়েৎ দেশে জমির স্বত্ব

জার-শাসিত রুশিয়ার কৃষি ছিল অত্যন্ত অনগ্রসর। নিজস্ব জমির অভাবে অধিকাংশ কৃষকের অবস্থা ছিল শোচনীয়। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে গম ও রাই উৎপাদনের ব্যাপারে পৃথিবীতে রুশিয়ার স্থান ছিল সবার নিচের দলে। ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ছিল রুশিয়ার ভাগ্য।

১৯১৭ সালে মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে সেই দুঃসহ অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটল। ১৯১৭ সালের ৮ই নভেম্বর দ্বিতীয় নিখিল রুশ সোভিয়েৎ কংগ্রেসে গৃহীত জমি সম্পর্কিত ঘোষণায় জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব বিলোপ করে দিয়ে রাষ্ট্রের স্বামিত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। উক্ত ঘোষণায় জমির ক্রয় বিক্রয়, ইজারা বা মর্টগেজ দেওয়া নিষিদ্ধ হল। সোভিয়েৎ শাসনের প্রথম ভূমি আইনে লিপিবদ্ধ হল কৃষকদেরই দাবি। সোভিয়েৎ শাসন রুশিয়ার মেহনতী কৃষক কুলের দুঃখ দুর্ভোগ চিরতরে ঘুচিয়ে দিল। সোভিয়েৎ রাষ্ট্র দেশের জমি করায়ত্ত করে তা বিনা মূল্যে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দিল।

ভূমি সংক্রান্ত ঘোষণার বলে কৃষকরা ১৫ কোটি ২০ লক্ষ ডেসিয়াটিনেরও বেশি (১ ডেসিয়াটিন = ২'৭ একর) জমির অধিকারী হলেন। আগে এই সব জমির মালিক ছিলেন জমিদার ও বুর্জোয়া শ্রেণী, জার পরিবার, মঠ ও গীর্জা। কৃষকদের আর জমিদারকে খাজনা দিতে হল না। প্রতি বছর এই খাজনার পরিমাণ ৫০ কোটি স্বর্ণ রুবল। গীর্জা ও মঠের ব্যয় নির্বাহের বোঝা ও আর কৃষকদের বইতে হল না। অধিকন্তু কৃষকরা ভূতপূর্ব্ব মালিকদের চাষাবাদের যন্ত্রপাতি পেয়ে গেলেন প্রচুর। ফলে কৃষকদের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হল। কিন্তু ছোট ছোট টুকরা জমিতে ফসলের উৎপাদন বাড়ান সম্ভব নয়, সম্ভব নয় আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক সার ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করা। ১৯২৯ সাল থেকে অধিকাংশ সোভিয়েৎ কৃষক যৌথ খামার পদ্ধতির আশ্রয় নিলেন। সোভিয়েৎ সরকার ট্রাক্টর, হার্ভেষ্টার কম্বাইন ও অন্যান্য বিবিধ যন্ত্রপাতি সরবরাহ দিয়ে কৃষকদের সাহায্য করতে থাকেন।

নতুন পন্থায় সুরু হল জমি চাষ, বীজ বোনা ও ফসল কাটার কাজ। অক্টোবর বিপ্লবের সুফলগুলি যৌথখামার পদ্ধতির সাফল্যে আরো জোরদার হল। যৌথ খামার, সরকারী খামার এবং মেশিন ও ট্রাক্টর ষ্টেশনগুলি এমন এক নতুন ধরণের অর্থনীতি, যা মানুষের ইতিহাসে আগে আর দেখা যায়নি, যা সোভিয়েৎ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক গঠনকার্য্যের অভিজ্ঞতা থেকে জন্মলাভ করেছে।

সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে কৃষির উন্নতি সাধন করে সোভিয়েৎ কৃষকরা ধন বৃদ্ধি করেছেন বহু গুণ। বিপ্লবের আগে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের হাতে ছিল ১৩কোটি ৭০ লক্ষ হেক্টার জমি। বর্ত্তমানে যৌথ চাষীদের জমির পরিমাণ ৪৮ কোটি ৮০ লক্ষ হেক্টারেরও অধিক, অর্থাৎ ৩৫ কোটি হেক্টার অধিক।

কৃষকদের ব্যক্তিগত আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধি তথা জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সোভিয়েৎ সরকার যৌথখামার গুলিকে জমির চিরস্থায়ী স্বত্বের দলীলপত্র দেন। সোভিয়েৎ শাসনতন্ত্রে ঘোষিত হয়েছে, "যৌথখামারগুলির অন্তর্ভুক্ত জোত জমি কৃষকদের বিনা মূল্যে ও অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে অর্থাৎ চিরকালের জন্যে ব্যবহার করতে দেওয়া হল।" কৃষি আর্টেলের বিধান অনুসারে যৌথখামারের জমির আয়তন কোনো মতেই হ্রাস করা যাবে না। যৌথচাষীরা জানেন, কোনো অবস্থায় কোনো উপায়ে তাদের বারোয়ারী জমি কখনো হস্তান্তরিত হবে না। জমি কেনার পেছনেও চাষীদের অর্থ ব্যয় করতে হয় না। তাঁরা সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করেন সর্বজনীন জোতজমির পেছনে—খামারের ঘরবাড়ী নির্মাণে, পশুপালনে, বৈজ্ঞানিক সার দেওয়ার কাজে বর্ষজীবি শস্য তৈরী ও অন্যবিধ উর্বরতা বৃদ্ধির কাজে।

যৌথখামারের বারোয়ারী জমি তার অর্থনীতি ও স্বচ্ছলতার দৃঢ় ভিত্তি। যৌথচাষীদের আয়ের প্রধান উৎস। যৌথখামারের মোট আয়তন থেকে প্রত্যেক সভ্য-চাষীকে তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে তাঁর বাড়ীর লাগোয়া এক টুকরা জমি দেওয়া হয় (শাকসব্জী ও ফলফুল জন্মাবার জন্যে)। এ জমি যৌথখামারেরই সম্পত্তি এবং যৌথখামারের চাষীদের কিছু কিছু ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়।

জমি সকলের সম্পত্তি ও আয়ের প্রধান উপায় বলেই এবং তার উপর চিরস্থায়ী মালিকানা স্বত্ব থাকার জন্যেই কৃষকরা কৃষিকার্য্যে সাফল্যের পর সাফল্য অর্জ্জন করে চলেছেন—ব্যবহার করছেন আধুনিক যন্ত্রপাতি, চালু করছেন ত্রাভোপাল শস্য আবর্ত্তন, তৈরী করছেন ক্ষেত-রক্ষক বনানী বলয় এবং জল সেচের ও উর্ব্বরতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গড়ে তুলছেন। যৌথ চাষীরা প্রকৃতি রূপান্তরের স্তালিন পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করছেন—অনাবৃষ্টি ও শুকনো বাতাসের উপদ্রব দূরীভূত করে দেশের অপর্যাপ্ত কৃষিসম্পদ বাড়াচ্ছেন।

★ মধু ও হুল ★

বাংলাদেশের লোকেদের বুদ্ধি শুদ্ধি কমে যাচ্ছে, এইরূপ একটা আক্ষেপ প্রায় শোনা যায়। আমাদের মনে হয় যাঁরা এসব কথা বলেন তাঁরা পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীদের খবর রাখেন না। পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী মাইতি মশাই পরিষদে কাপড় ও খাদ্যদ্রব্যের অভাব দূর করার জন্য যে নয়া পরিকল্পনা বাতলেছেন, তাতে অন্যদেশে হলে তাঁকে ডক্টরেট উপাধি দেওয়া হত। তিনি বলেচেন কাপড় ছেড়ে হাফ-প্যাণ্ট পর আর ছাদে খাদ্য ফলাও। বাংলার মাটীরই উর্ব্বরতা কমে গিয়েছে; সুতরাং ছাদে ফসল ফলাতে হলে সেই মাটীতেই তো ফলাতে হবে। তাতে কি লাভ কিছু হবে? তার চেয়ে মন্ত্রী মশাই এর মস্তিষ্কটি যে রকম উর্ব্বর তাতে যদি বীজ বোনা যায় তাহলে অঢেল ফসল ফলবে সন্দেহ নেই। ভারত সরকারের উচিত সিন্ধ্রিতে যে সার উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য কোটী কোটী টাকা সাহেবদের পকেটে আর চুরি চামারিতে ঢালা হচ্ছে তা বন্ধ করে দিয়ে মাইতি মশাই এর মত উর্ব্বর মস্তিস্ক সম্পন্ন মন্ত্রী খুঁজে বের করা এবং তাঁদের মাথায় চাষের ব্যবস্থা করা। তাহলে দেশের টাকা বিদেশীর পকেটে যায় না আর দেশবাসী খেয়েও বাঁচে।

●

বোঝা যাচ্ছে, বাঙ্গালীর মোক্ষলাভে দেরি নেই। সাধু সন্ন্যাসী হতে আরম্ভ আর হিন্দুদের দেবাদিদেব মহাদেব পর্য্যন্ত সকলেই আবগারি দ্রব্যের প্রশংসা করে গিয়েছেন। সংসার মায়া—এই জ্ঞান আনতে হলে ও জিনিসগুলি অপরিহার্য্য বলেই শোনা যায়, তাই বোধ হয় ধর্ম্মপ্রাণ পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী মদ গাঁজা আফিং এর প্রচারে লেগেছেন। দিন কতক আগে যখন বন মহোৎসব মহা উৎসাহে পালিত হচ্ছিল তখন পশ্চিম বাংলার আবগারি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী একটি গাঁজার চারা পুতেছিলেন। সেই চারাটি নিশ্চয় আজ ফলে ফুলে সমৃদ্ধ হয়েছে, কারণ তা না হলে মন্ত্রী বর্মন মশাই কেন পরিষদে বলবেন—"শত শত বছর ধরে মদ গাঁজা অফিং খাওয়া চলে আসছে; সুতরাং আরও কিছু দিন এই প্রথা চললে কোন ক্ষতি নেই। তাছাড়া জাতীয় স্বার্থে অর্থাৎ দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্ন ও অন্যান্য পরিকল্পনা কার্য্যকরী করতে হলে মদ গাঁজা অফিং খাওয়া চালু রাখা দরকার।" জয় গুরু! এতদিনে সাধনার সিদ্ধি দিলে বাবা! পথ যখন পাওয়া গিয়েছে, বাঙালী আবাল বৃদ্ধ বণিতা, সাধনার পথে পা বাড়াও। পঞ্চরঙের কোলকেয় টান মেরে বুঁদ হয়ে বসে থাক, তাহলেই দেখবে দেশবাসী আপসে শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এই না হলে দাওয়াই!

●

অর্থমন্ত্রী চিন্তমণি দেশমুখ পার্লামেণ্টে জানিয়েছেন—মন্ত্রীদের দপ্তরে ব্যয় সঙ্কোচের যে প্রস্তাব করা হয়েছিল গত বছর কেহই তা করেন নি। আগামী বছরেও বিশেষ ভরসা নেই। তবে অন্যদিকে ব্যয় সঙ্কোচের চেষ্টা হচ্ছে। দেশমুখ সাহেব বিনয়ী বলতে হবে। তিনি শুধু দু বছরের হিসাব দিয়ে কেন যে চুপ করে গেলেন বোঝা গেল না। তাঁর বলা উচিত ছিল—গত বছর হয় নি, আগামী বছরেও সম্ভাবনা নেই, কোন বছরেই ভরসা দেখি না। অন্য বিষয়ে যেমন গরীব কর্মচারী ছাঁটাই—খরচ কমান হচ্ছে তা বলার কোন দরকারই পড়ে না, কারণ রামরাজত্বে তা তো স্বতঃসিদ্ধ। কংগ্রেসী মন্ত্রী হয়েও যদি নিজের খরচ কমাতে হয় তাহলে দুঃখ রাখার ঠাঁই কোথায় থাকে? সুতরাং খাও দাও উড়াও খরচ, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্তৃক পরিবেষক প্রেস, ২৩ ডিক্সন লেন হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।